ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

সুলতানি আমলে বাংলার বাসগৃহ ও বাস্তুপরিবেশ

*ড. মো. ওসমান গনী**

ভূমিকা

সমাজবদ্ধ মানুষের অন্যতম প্রয়োজন হলো বাসগৃহ। একটি অঞ্চলের আবহাওয়া ও উপকরণের সহজলভ্যতা বাসগৃহের গড়ন ও বাস্তুপরিবেশ রচনায় প্রভাব বিস্তার করে। অনুরূপভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যা সুস্পষ্ট প্রভাব বজায় রাখে। সুলতান-শাসক-অভিজাতদের বাসগৃহ নির্মাণে পলিমাটি দ্বারা তৈরী পোড়ানো ইট, কাঠ, পাথরের যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে। দরিদ্রদের ক্ষেত্রে স্থানীয় সাদামাটা উপকরণের ব্যবহার হয়েছে। কাঠ, বাঁশ, কাদা-মাটি, খড়, গোলপাতা, তালপাতা ও খেজুরপাতার আচ্ছাদনে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচবার লক্ষ্যে স্বল্প পরিসরের ঘর তৈরি হয়েছে। লক্ষণীয় যে, উভয় ধরনের বাসগৃহের মধ্যে নির্মাণশৈলী ও বাস্তুগত পরিবেশ বিবেচনায় বড় ধরনের পার্থক্য ছিল না। 'চালাশৈলীর' ব্যবহার তার প্রমাণ বহন করে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা–স্থানীয় উপকরণ ও আবহাওয়া প্রভাবজ ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন ও সমকালীন বাংলাসাহিত্য, পর্যটকদের বিবরণী ও প্রত্নসাক্ষ্যের আলোকে সুলতানি বাংলার বাসগৃহ ও বাস্তুপরিবেশ বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলার জলবায়ু ও বাস্তুসামগ্রীর লভ্যতা

গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত বাংলার আবহাওয়া খুবই আর্দ্র। বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর। ফলে বিশেষ করে বর্ষাঋতুতে বাসোপযোগী বাসগৃহ এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে ছাদের পানি সহজে নীচে গড়িয়ে পড়তে পারে। একারণে ছাদ ঢালু করা হয়। ঢালু ছাদ সৃষ্টির মূলে সহজলভ্য কাদা-মাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিলে রয়েছে অজস্র পলিমাটি। সহজলভ্য এই পলিমাটি দিয়ে রৌদ্রে পোড়া ইট দ্বারা যেমন তৈরি হয়েছে অট্টালিকা, তেমনি তৈরি হয়েছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় জন্মানো অসংখ্য বাঁশের তৈরী ঘরবাড়ি।

গ্রীষ্মমণ্ডলে বাঁশই গৃহনির্মাণের উপকরণ হিসেবে সর্বাধিক জনপ্রিয়, সহজলভ্য ও স্বল্প ব্যয়বহুল। চালাঘরের প্রধান উপকরণ হিসেবে বাঁশ অপরিহার্য। আর্দ্র আবহাওয়ায় প্রকৃতির চমৎকার উপহার বাঁশের বিভিন্ন জাতের কথা আমরা জানতে পাই।[১] এ সমস্ত বাঁশ খুঁটি, ভারআড়া, পাড়, ঠেকনা, ছাদের কাঠামো ও বেড়া তৈরির কাজে ব্যবহৃত

*সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর।

হওয়ার কথা জানা যায়। বাঁশের কাঠামোর উপর বিভিন্ন ধরনের খড়, তালপাতা, গোলপাতা, খেজুরপাতা প্রভৃতি বিছিয়ে চালা তৈরি করা হতো। কিছু কিছু এলাকায় খড় বা পাতা ছাউনির পরিবর্তে মাটির খোলা বা টালি ব্যবহারের কথা জানা যায়।[২]

সমকালীন বাংলায় বিভিন্ন ধরনের চালাঘরের উল্লেখ আছে। দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একচালা বা ছেপড়াচালা, দোচালা বা বাংলাঘরের প্রচলন ছিল। ধনবান লোকেরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে চারচালা, আটচালা ও বারোচালা ঘর তৈরি করত। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচলিত ছিল বারদুয়ারী বা বারবাংলা ঘর। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের জন্য এ ধরনের চালাঘর খুবই উপযুক্ত ছিল। বাঁকানো বাঁশ দিয়ে প্রস্তুত কার্নিশযুক্ত খড়ের ছাউনির কুটির 'চালাশৈলী' নামে পরিচিত। এই চালাশৈলীর অনুকরণে আমরা কাঠ ও ইটের বাড়ির ছাদ দেখতে পাই। বাংলার কুঁড়েঘরের আদর্শ প্রাচীনকালের সারনাথের শুঙ্গস্তম্ভে জোড়বাংলার নকশায় পরিদৃষ্ট হয়।[৩]

মুসলমানদের আগমনের ফলে গৃহ ও সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে দুটো উন্নততর প্রযুক্তির সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। এ দুটো প্রযুক্তি হলো: কংক্রিট (চুন, বালি, সুরকি ও পাথরকুচি প্রভৃতি মিশ্রিত পিণ্ড) এবং মর্টার (চুন, বালি ও জলমিশ্রিত সংযুক্তিকরণ মশলা বা পলেস্তারা)[৪]। কংক্রিট ও মর্টারের ব্যবহার বাংলার সংযুক্তিকরণ মসলার জোরেই মুসলমানদের পক্ষে প্রকৃত খিলান ও গম্বুজের সাহায্যে বড় এলাকা জুড়ে বিশাল সৌধ নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। ক্রমশ সৌধগুলি আড়ম্বরপূর্ণ ও মহিমান্বিত রূপ নেয়, যা আগে কখনও এদেশে দেখা যায়নি।

কতিপয় সুলতানের প্রাসাদ

সুলতান ও অভিজাতবর্গ ঐ ধরনের প্রাসাদে বসবাস করতেন। সুলতান জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে আগত চৈনিক দূতগণ ইট ও সুরকির গাঁথুনিতে তৈরী নয়নাভিরাম রাজপ্রাসাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন, 'যে সিঁড়ি বেয়ে প্রাসাদে উঠতে হয় তা উঁচু আর চওড়া। ভিতরের দিকটা চুনকাম করা। প্রাসাদটিতে নয়টি মহল এবং তিনটি দরজা আছে। থামগুলি পিতলের রং-এর এবং পালিশ করা। গায়ে নানারকম ফুল ও জীবজন্তুর ছবি খোদাই করা ছিল। ডাইনে এবং বামে লম্বা লম্বা অনেকগুলি বারান্দা আছে। উক্ত বর্ণনায় আরও জানা যায় যে, দালানগুলি উঁচু ও প্রশস্ত। রাজপ্রাসাদের ছাদ চ্যাপ্টা, চতুষ্কোণ ও সাদা ধবধবে।'[৫]

সুলতান বারবক শাহের আমলে এ ধরনের নয় মহলা সুরম্য প্রাসাদের উল্লেখ আছে। সৌন্দর্যরসিক বারবক শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রাসাদটির গাঁয়ে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি[৬] সূত্রে জানা যায়, প্রাসাদটির মধ্যে উদ্যানের মতো একটি স্তম্ভ ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ করত। এর নীচ দিয়ে একটি পরম রমণীয় জলধারা প্রবাহিত হতো। প্রাসাদটিতে 'মধ্য তোরণ' নামে একটি অপূর্ব সুন্দর বিশেষ প্রবেশ

পথ হিসেবে নির্মিত তোরণ ছিল। এই প্রাসাদের নয়টি কক্ষ অতিক্রম করে কৃত্তিবাস রাজদরবারে পৌঁছেছিলেন।[৭]

সে আমলের আরও গগনভেদী সৌকর্যময় প্রাসাদের কথা জানা যায়। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জ্যো আঁ- দ্য- বারোস (১৬শ শতাব্দী)-এর গ্রন্থসূত্রে আমরা সমকালীন বাংলার সুলতান ও আমির-ওমরাহ্দের নয়নাভিরাম হর্ম্যরাজি সম্পর্কে অবগত হই। গৌড়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'এই শহরের একটি বড় অংশ সুরম্য ও সুনির্মিত প্রাসাদে ভর্তি। স্বর্ণ-মণিমুক্তামণ্ডিত ঘরের উল্লেখ আছে'।[৮] সেকালে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে বেহেস্ত ও সে বেহেস্তে হুরিদের বাস এবং অতুলনীয় বিলাসবহুল প্রাসাদাবলির প্রাচুর্য। প্রতিটি প্রাসাদ-উদ্যানের উচ্ছলিত ফোয়ারার লাস্যে চোখ জুড়াত। চন্দন কাঠ দিয়ে বাড়ির থাম বসানো হতো। চিনদেশের টালি দিয়ে মেঝে ও ঘরের দেওয়াল তৈরি হতো। ফলের কেয়ারি ও পাথরের জল সেচনালি বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত।[৯]

উপরে বর্ণিত প্রাসাদগুলো মূল্যবান ইট ও পাথরের সমাহারে নির্মিত হওয়ার কথা জানা যায়। একটি গ্রন্থে হীরা-মণি-মাণিক্য ও অন্যান্য রত্নখচিত প্রাসাদের উল্লেখও আছে। বহুবর্ণিল চিত্রে সুশোভিত সাতমহলা প্রাসাদের সৌকর্য-সুষমায় 'চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীন প্রভা মনে হয়'।[১০] আব্দুল হাকিমের '*লালমতি-সয়ফুলমূলক*' কাব্যে একটি রাজপ্রাসাদের বর্ণনা মেলে।[১১] তাতে অমূল্য মরকতের সিঁড়ি আর হীরা-মাণিক্যের বেড়ায় কবি যে কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন তার সবটুকু সত্য না হলেও তাতে তৎকালীন সমাজের ধনিক ও অভিজাত শ্রেণির মানুষের জাঁকজমকের চিত্র ফুটে উঠেছে।[১২]

নদীবহুল বাংলার বাস্তুপরিকল্পনায় সুলতানদের প্রাসাদ-অট্টালিকারাজি কুলকুল রবে বহে যাওয়া নদীর ধারেই যে স্থান পেত, তা রুকনউদ্দীন বারবক শাহ ও নসরত শাহের প্রাসাদের বর্ণনাদৃষ্টে অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। নদীর জলে প্রাসাদের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হতো এবং রাতে তার ছায়া পড়ত। প্রাকৃতিক মাধুর্যের ছোঁয়ায় প্রাসাদ যেন আরও মোহময়ী হয়ে উঠত। বিশাল এলাকা জুড়ে নির্মিত এ প্রাসাদে থাকত অসংখ্য দরজা, কক্ষ ও খেলার মাঠ।[১৩] চওড়া মাঠে বারো জন অশ্বারোহীর পোলো খেলার কথা জানা যায়। প্রাসাদ ঘিরে বহুবর্ণিল ফুলে সুরভিত উদ্যান শোভা পেত। এছাড়াও ছিল প্রাসাদের চারপাশে প্রচুর খোলা জায়গা। সুলতানদের রাজপ্রাসাদের অনুরূপ অভিজাত ও বিত্তবানরা তাঁদের বাসগৃহ নির্মাণ করতেন। কে. এম. (কুনওয়ার মুহম্মদ) আশরাফের ধারণা, সুলতানদের তুলনায় অভিজাতদের জীবনে বিপদ ও অনিশ্চয়তার আশঙ্কা ছিল কম, কিন্তু তাদের আর্থিক প্রাচুর্য ছিল। তাই অভিজাতদের গৃহ পরিমণ্ডলে শান্তি ও বিশ্রান্তির স্নিগ্ধতা ছিল বেশী। সেখানে সমতল ছাদবিশিষ্ট ইটের দালান, সিঁড়ি ও গৃহসংযুক্ত স্নানাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪]

বংশীদাস রায়ের *‘পদ্মপুরাণে’* আমরা শিবপুরীর বিবরণ পাই।[১৫] তাতে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন সমাজে ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর মানুষ যে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ গৃহে বাস করতেন তাতে সন্দেহ করার অবকাশ কম।

বাস্তুপরিবেশ ও রকমফের

প্রাচীন আমলে বাংলার চুনকাম করা ধবলগৃহ ও দেউলের কথা জানা যায়। সে ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল বলে মনে হয়। সুলতানি আমলে খোদাই করা কাঠের দরজায় শিল্পীর সূক্ষ্ম কাজের স্বাক্ষর থাকত। গৃহের সদর দরজায় ‘হরিমুখ’ (সিংহমুখ) শোভা পেত।[১৬] প্রাসাদসমূহ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অভিজাত ও ধনবানদের বাসগৃহ এলাকায় নৈসর্গিক পরিবেশ বিরাজ করত। বাসগৃহ সংলগ্ন ফুল ও ফলের বাগান থাকত।[১৭]

বাগানের মতো বাসগৃহের একধারে পরিখা বা পুকুর থাকত। প্রাচীন আমলে বাংলায় গৃহসংলগ্ন জলাধার বা পুকুরের চল ছিল। সুলতানিযুগেও সচ্ছল গৃহস্থরা পারিবারিক প্রয়োজনে অন্তঃপুরে পুকুর কাটত এবং তার চারদিকে ঘাট নির্মাণ করত।[১৮] সুলতানি বাংলার বাস্তুপরিকল্পনায় এটি একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। সমতটের নদীবহুল অঞ্চলে নৌযাত্রা প্রশস্ততর ছিল বলে সেখানে বাড়িসংলগ্ন পুকুরের সঙ্গে খালের মাধ্যমে যোগাযোগ হতো।[১৯] যাতায়াত ছাড়া স্নানের প্রয়োজনে এ সমস্ত পুকুর ব্যবহৃত হতো । অনেকে পুকুর থেকে পানীয়জল সংগ্রহ করত। কেউ কারো পুকুরে যেত না। এতে প্রতীয়মান হয়, তখন প্রায় সকলের বাড়িসংলগ্ন পুকুর বা খাল ছিল।

সেকালের অভিজাত ও ধনবানরা টুঙ্গী (উচ্চ হাওয়াখানা) ঘরে বসবাস করতেন।[২০] চালাঘরের অনুকরণে এ সমস্ত গৃহ নির্মিত হতো। টুঙ্গী ঘর সাধারণত আটচালার অনুরূপ ছিল। প্রসঙ্গত কাজলরেখার পালাতে আমরা ‘কামটুঙ্গী’ ও ‘জলটুঙ্গীর’ কথা জানতে পারি। কামটুঙ্গী উঁচুভিটিতে বা পুকুর পাড়ে নির্মিত হতো। নববিবাহিত দম্পতিদের রাত্রিনিবাস হিসেবে কামটুঙ্গীর বহুল প্রচলন ছিল। একটি কাব্যে এটি ‘উদয়মঙ্গল’ নামে আখ্যায়িত হয়েছে।[২১]

‘জলটুঙ্গী’ দীঘি বা পুকুরের মধ্যে নানারূপ কলা শিল্পমণ্ডিত হয়ে জলের উপর জলপত্রের মত উঁচু হয়ে থাকত। চারদিকে কুমুদ ও পদ্মফুল ফুটত। তার গন্ধে সুবাসিত বায়ু গৃহে প্রবেশ করে গৃহীর অঙ্গ পুলকিত করত। প্রাচীন আমলে সুইজারল্যান্ডের জলের উপর এ ধরনের ঘরের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।[২২] মুন্সীগঞ্জের টুঙ্গীবাড়ি ও গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া আজও অতীত বাংলার টুঙ্গীঘরের স্মৃতি বহন করছে। *‘মনসামঙ্গল’* কাব্যে সাহুবেনের স্ত্রী অমলার সুদৃশ্য ও অলঙ্কৃত গৃহের উল্লেখ আছে। এ ধরনের সুরম্য বাসগৃহ সেকালে ‘উদয়তারা’ নামে পরিচিত ছিল।[২৩] আমাদের ধারণা, সম্ভবত রাজস্থানের উদয়পুরের গৃহকে আদর্শ করে ‘ইউসুফ

জোলেখা' ও '*মনসামঙ্গল*' কাব্যে যথাক্রমে 'উদয়মঙ্গল' ও 'উদয়দতারা' নামকরণ করা হয়েছে।

উচ্চবিত্ত এবং ধনবান বণিক শ্রেণীর মানুষদের অজস্র অর্থব্যয়ে বাঁশ-খড়ে নির্মিত ঘরে বসবাসের বাতিক ছিল। তাদের বসতবাড়ি বাঁশের তৈরি এবং সেগুলোর কোনো কোনোটি এমনভাবে নির্মিত হতো যে একটি বসতবাড়ি নির্মাণ করতে পাঁচ হাজার টাকারও বেশি খরচ হতো।[২৪] মুঘল আমলেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। মির্জা নাথান যশোর জয় করার পর তেতলাবিশিষ্ট সুপারিগাছের বাংলাঘর তৈরি করেছিলেন। যশোরের খগরঘাটায় মুঘল আমলে গৃহনির্মাণের এ ধারা অব্যাহত ছিল। বাদশাহি কর্মচারীরা এক হাজার পাঁচ শত টাকা খরচ করে এক একটি বাংলো নির্মাণ করত।[২৫] খড়ের তৈরী এমনি ধরনের ঘর নির্মাণে বারো হাজার টাকা থেকে ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হতো।[২৬] এসব ঘর টিকতও দীর্ঘদিন ।

এসব গৃহ প্রায়ই চারচালা বা আটচালা বিশিষ্ট হতো। অবস্থাপন্ন লোকেরা সাধারণত আটচালা ঘরে বসবাস করত। বাংলাঘর দোচালা ও বারোচালা হতো। এগুলো বক্রাকার কার্নিশসহ খড়ের ছাউনি দেওয়া চালা ঘরের ছিল। বণিকরাজ মুরাই নির্মাণ করেছিলেন 'বড় বড় ঘর তার চারচালা আটচালা'।[২৭] বাঁশ ও কাঠের নির্মিত এসমস্ত চালাঘর হতো অসাধারণ কারুকার্যখচিত। গৃহের কড়ি-বর্গা খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়ানো হতো। ছাদ মোড়ানো হতো মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণ পত্রে। স্থানে স্থানে অভ্র পাতের প্রলেপ থাকত। কোনো কোনো ছাদ মাছরাঙ্গা পাখি ও ময়ূরের পালকে আবৃত হয়ে সূর্যকিরণে ঝলমল করত।[২৮] সম্ভবত এ কারণে সেকালে মাছরাঙ্গা পাখির পালক বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়েছিল। বাংলার অনুকরণে চিন দেশেও মাছরাঙ্গা পাখির পালক দিয়ে ঘরের ছাদ সাজানো হতো।[২৯]

বস্তুত সেসময়ে বাংলাঘর অভিজাত ও উচ্চবিত্তদের নিকট দারুণভাবে সমাদর লাভ করে। উলুছনের ছাউনি ও সুন্দিবেতের বেড়াযুক্ত বাংলাঘর খুবই জনপ্রিয় ছিল। এসকল ঘর অধিকাংশ চৌচালা ও আটচালা বিশিষ্ট হতো।[৩০] বহিরাগত পর্তুগীজরাও দেশীয় রীতির চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাদের বাড়ি-ঘর বাঁশ-খড় দিয়ে তৈরি করেছিল। [৩১]

দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মানুষেরা গ্রামে বাস করত। তাদের ঘর-বাড়ি কাঠ, বাঁশ, কাদামাটি, তালপাতা আর খাড়ের ছাউনির হতো। *সদুক্তিকর্ণামৃত*-এর একটি শ্লোকে উল্লেখ আছ: 'কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেওয়াল গড়িয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে, কেঁচোর সন্ধানে নিয়ত ব্যাঙের দ্বারা আমার গৃহ আকীর্ণ'।[৩২] চর্যাগানেও আমরা সমকালীন বাংলার বসতি ও বাসগৃহের ইঙ্গিত পাই। তাতে কুঁড়েঘরের উল্লেখ আছে।[৩৩] দরিদ্র মানুষদের ঘরের ছাউনি খড়ের হতো।[৩৪]

দোকানপাট, মাদ্রাসা নির্মাণে খড়ই ছিল অন্যতম উপাদান।[৩৫] এসকল ঘর অপরিসর ও ক্ষুদ্রাকার হতো।[৩৬] সাধারণ মানুষের গৃহ ব্যাধ ও কালকেতুর গৃহের মতই অতি সাধারণ ছিল। তালপাতার ছাউনি ও ভেরেন্ডার খুঁটি দ্বারা নির্মিত কুঁড়েঘরে ছিল তাদের বাস।[৩৭] আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সেকালে তালপাতা, গোলপাতা, উলুছন ও হোগলাপাতার ছাউনির প্রচলন ছিল। এগুলো এত দুর্বল ছিল যে অল্প বাতাসে উড়ে যেত।

ঘরের উপরে খড় অথবা খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া হতো। শীতলপাটি দিয়েও ঘরের বেড়া তৈরির কথা জানা যায়। সুন্দিবেত ও নলখাগড়ার বেড়ারও প্রচলন ছিল। অনেকে আবার পাটকাঠি দিয়ে ঘরের বেড়ার কাজ করত। বাংলার বাইরেও পাটকাঠির বেড়ার প্রচলন ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও নিউজিল্যান্ডের মাউরীরা পাটকাঠির বেড়া বানাত। তারা পাটকাঠির বেড়ায় কাদা মাখানোর পর শুকিয়ে বেড়া হিসেবে ব্যবহার করত।[৩৮] সমকালীন বাংলায় কঞ্চি ও চাটাই-এর বেড়া কাদার প্রলেপ দিয়ে বানানোর উল্লেখ আছে।[৩৯] এসমস্ত ঘরে সাধারণত জানালার ব্যবস্থা থাকত না। ফলে বেড়া ভেদ করে ঘরের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করত। আজও বাংলাদেশে এ ধরনের ছোট ঘরের আধিক্য লক্ষ করা যায়।

ঘরের বেড়া হিসেবে কোনো কোনো এলাকায় কাদামাটির দেয়াল দেওয়া হতো। সতেরো শতকে বাংলার পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে মাটি দিয়ে তৈরী বাড়ি-ঘরের বহুল প্রচলন ছিল। পর্যটক ট্যাভারনিয়ের-এর বর্ণনা এসম্পর্কে আলোকপাত করে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সুবাদারের আবাসটি উঁচু দেওয়াল ঘেরা ছিল।[৪০] দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেন যে, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল যেখানে পাহাড়ি মাটি শক্ত সেখানে মাটির সুন্দর সুন্দর ঘর নির্মিত হতো।[৪১] সতেরো শতকের শুরুতে ইসলাম খান তাঁর সুবাহকে শক্তিশালী করার জন্য ঘোড়াঘাটে আগমন করেন। সে কারণে বহু বাড়ি-ঘর নির্মিত হয়েছিল। এসমস্ত এলাকায় সুলতানি আমলের অসংখ্য মাটির দুর্গ দৃষ্টে আমরা অনুমান করতে পারি যে, সেসমস্ত বাড়ি-ঘর মাটির দেয়ালের তৈরি ছিল। মাটির তৈরি ঘরগুলোর ছাদে ছাউনি থাকত। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে খড়ের পরিবর্তে টালিসদৃশ এক ধরনের খোলা ব্যবহার করা হতো বলে জানা যায়। অনেকে দেয়ালে চুনকাম করত।

সুলতানি আমলে বাংলায় কোঠাঘরের প্রচলন ছিল। খড়ের চালের নীচে মাটির সমান্তরাল ছাদ থাকত। কোঠাঘরে সাধারণত একটি মাত্র দরজা দেওয়া হতো। ইটনির্মিত কোঠাঘর নির্মাণের রীতি ছিল। নগরের লোকেরা অবশ্য ইট দিয়ে কোঠাবাড়ি তৈরি করত। সেকালে কাঠের ঘরের প্রচলন ছিল। সাধারণভাবে কাঠ দিয়ে খুঁটি-বর্গা তৈরি হতো। ফিরুজশাহ তুগলক দ্বিতীয়বার একডালা দুর্গ অবরোধকালে অস্থায়ী আবাস হিসেবে বহু কাঠের ঘর নির্মাণ করেছিলেন।[৪২] বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত এলাকায় কাঠের ঘরের বেশ প্রচলন

ছিল। কাঠের সুলভতা ও আরাকানের গৃহ নির্মাণের প্রভাবেই সম্ভবত ঐ অঞ্চলে কাঠের ঘর নির্মিত হতো।

প্রাচীন আমলের ধারা অনুসরণ করে বাংলায় চতুষ্কোণাকারে ঘর নির্মিত হতো। চতুষ্কোণাকৃতির ঘর ছাড়া তখন অর্দ্ধবৃত্তাকার চালাবিশিষ্ট দোচালা ঘরেরও প্রচলন ছিল। এ ধরনের ঘরকে 'জুইতের ঘর' বলা হতো। এই শ্রেণীর ঘরের চালে এত বেশি বাঁক দেওয়া হতো যে, চালের নীচের দিকের কোণগুলো একেবারে ভিতরে এসে যেত। ঘরের মটকা বহু উঁচুতে থাকত। গালা বা লাক্ষা দিয়ে জৌঘর নির্মাণ করা হতো। 'জৌঘর' শব্দটি জতুগৃহ থেকে জাত। মহাভারতের আদিপর্বে জতুগৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৩] এক সময়ে সম্ভবত জহরব্রত পালনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের ঘর নির্মিত হতো। আমাদের ধারণা, প্রাচীন কালের জতু বা জৌগৃহ আলোচ্যযুগে জুইত বা পছন্দের গৃহে রূপান্তর লাভ করে।[৪৪]

বসতির আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, সেকালে তিন ধরনের বসতি ছিল। যেমন–বিক্ষিপ্ত, সারিবদ্ধ ও অনুকেন্দ্রিক।[৪৫] তবে মনে হয়, অধিকাংশ লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত। সীমিত পরিসরে এক খণ্ড জমিতে মাটি তুলে ভিটে তৈরি করত। মাটি দলে পিষে মেঝে তৈরি হতো। কখনও মাটির মেঝের উপর গোবরের পলেস্তারা পড়ত। এভাবে বাড়ি তৈরি করা হতো। এসমস্ত বাড়ি-ঘর শীতের তীব্রতা, গ্রীষ্মের দাবদাহ ও বর্ষার প্রচণ্ডতার হাত থেকে বাঁচার জন্য ন্যূনপক্ষে যা দরকার ছিল, সেসব উপাদানের সাহায্যে নির্মিত হতো।[৪৬]

দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের বাড়ি অনেক ছোট এবং কম শক্ত ছিল। এদের ঘরের সংখ্যাও খুব কম হতো। বলা যায়, দরিদ্র লোকদের সাকুল্যে একখানি ঘরই ছিল সম্বল। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে হরিহোরের বাড়ির বর্ণনা মেলে। তাতে দেখতে পাই, 'ভাঙ্গা কুড়ে ছাওয়া পাতে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা তাতে'। অর্থাৎ মাত্র একখানি ঘর, যেখানে মাতা-পিতা থাকে।[৪৭] আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এসমস্ত বাড়িতে জানালা থাকত না। বেড়া ভেদ করে প্রয়োজনীয় আলো বাতাস প্রবেশ করত। বাড়ির সামনের দেওয়াল বা বেড়ায় খানিকটা ফাঁকা রাখা হতো। ঐ ফাঁকটিই ছিল প্রবেশ পথ।[৪৮]

অবস্থাপন্ন কৃষকদের বাড়ির আকার বড় ছিল। তাতে তিনটি হতে পাঁচটি ঘর থাকত।[৪৯] সাধারণত বাড়িটি কয়েকটি অংশে ভাগ করা হতো। চমৎকার চত্বরসংলগ্ন শয়নকক্ষ, প্রক্ষিপ্ত বারান্দাসহ বসার ঘর, রান্নাঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের ব্যবস্থা থাকত।[৫০] বস্তুত বাড়ির বিভিন্ন অংশের বিন্যাস চমৎকার সৌন্দর্যবোধ ও শিষ্টাচারের পরিচয় বহন করত। চূড়ামণিদাস বর্ণিত চৈতন্যের বাসগৃহে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন, 'চমৎকার বাড়িটির একটি দরজা দক্ষিণে, একটি পূর্বদিকে। পূর্বদিকের দরজার পরে একটি পরিশীলিত অঙ্গন'।[৫১]

সেকালে বাড়ির ভিতরের কক্ষাদির নামকরণ করা হতো। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ প্রবণতা বেশি দেখা যায়। যেমন– 'হাতিনা', 'পিঁড়া' ও 'আওলা'। ঘরের প্রবেশ কক্ষ হাতিনা, মধ্যকক্ষ পিঁড়া (Inner appartment) ও পেছনের শেষ কক্ষ 'আওলা' নামে পরিচিত ছিল।[৫২] এতে অনুমিত হয়, সেকালে একাধিক কক্ষবিশিষ্ট চারচালা বা আটচালা ঘর তৈরি হতো। একটি কাব্যসূত্রে বাসগৃহের বিভিন্ন অংশের কথা জানা যায়। সেখানে উল্লেখ আছে– 'পাঁচখণ্ড বাড়ি তার সোনাতে বান্ধিয়া'। প্রসঙ্গত সদরবাড়ি, অন্দরবাড়ি, পূজাবাড়ি, রান্নাবাড়ি ও গোহালবাড়িকে নিয়ে পাঁচখণ্ড বাড়ির কথা বলা হয়েছে।[৫৩]

বাসগৃহের প্রাচীরের ভিতর আঙ্গিনা ও প্রাঙ্গণ সীমায় সদর দরজা থাকত।[৫৪] সুকুমার সেনের ধারণা, সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়ি সদর ও অন্দর মহলে বিভক্ত ছিল। সদর মহলে বিভিন্ন কাজকর্ম হতো। রন্ধনশালা অন্দরমহলের মধ্যে থাকত। এছাড়া অন্দরমহলের 'আচপনশাইল' (মুখ-হাতে ধোওয়ার ঘর) নামে একটি ঘর সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।[৫৫] সদর মহলের সামনে অঙ্গন বা উঠান থাকত। জমির ফসল এখানে আনা হতো।[৫৬] হিন্দু সমাজের পবিত্রতার প্রতীক গোবর দিয়ে ঘর ও উঠানের মেঝে নিকানো হতো। ভার্থেমার (১৬শ শতাব্দী) বিবরণে বাড়িতে মহিলাদের ঘন ঘন এ কাজ করার উল্লেখ মেলে।[৫৭]

প্রাক-সুলতানি আমলে উপকারিকা বা উয়ারি নামধেয় এক ধরনের ঘরের কথা জানা যায়।[৫৮] এটি সদর মহলের অন্তর্ভুক্ত একটি ঘর যেখানে বাইরের কাজকর্ম হতো। উয়ারির বিপরীতে আমরা মণ্ডপের কথা জানতে পাই। এটিও সদর মহলের অর্থাৎ বাড়ির বাইরের একটি ঘর।[৫৯] পূজা অথবা সাময়িক প্রয়োজনে সমবেত লোকদের আশ্রয়ের জন্য মণ্ডপের কথা জানতে পাই। অভ্যাগত অতিথিদেরকে মণ্ডপে বসতে দেওয়া হতো। মণ্ডপের চারদিকে কোনো বেষ্টনী দেয়াল বা বেড়া থাকত না। খুঁটির ওপর থাকত খড়ের চাল। এগুলো আয়তন অনুসারে চারচালা বা আটচালা হতো। প্রাচীন আমলে ধনবান ও সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়িতেও মণ্ডপের বহুল প্রচলন ছিল। সৌহাগৌর প্রত্নফলকের শীর্ষে অঙ্কিত একটি আটচালা মণ্ডপের চিত্র দৃষ্টে তা আমরা জানতে পাই।[৬০]

উপর্যুক্ত সাধারণ মণ্ডপ ছাড়াও বড়লোকদের বাড়িতে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, অনাথশালা ও পৃথক অতিথিশালা স্থাপিত হতো।[৬১] প্রবাসীদের ব্যবহারের জন্য 'দীঘল মন্দির' থাকত।[৬২] বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্য থেকে জানা যায়, রাস্তাঘাটে অথবা জঙ্গলের ধারেও পূজার ঘর নির্মিত হতো।

মণ্ডপ, অতিথিশালা বা উয়ারির বিপরীতে মুসলমানদের বাড়িতে বৈঠকখানার সংস্থান থাকত। 'বৈঠক' শব্দটি ফার্সি ভাষার।[৬৩] সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে,

বিশেষ ধরনের এই ঘরটির প্রচলন ইতিপূর্বে এদেশে ছিল না। মুসলমানদের আগমনের পর বাস্তুপরিকল্পনায় বাড়ির বাইরে একটি চত্বর রাখতে দেখা যায়। চত্বরসংলগ্ন করে নির্মিত হতো বৈঠকখানা। বৈঠকখানা সাধারণত অতিথি অভ্যর্থনা ও সাময়িক অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে শ্রান্তি-বিনোদনের কাজেও বৈঠকের ব্যবহার শুরু হয়। মুসলমানদের অনুকরণে হিন্দুদের মধ্যেও বৈঠকখানার ব্যবহার হতে দেখা যায়। হিন্দুদের বৈঠকখানা হতো প্রায়শ পূর্বমুখী, কখনও বা দক্ষিণমুখী। কিন্তু মুসলমানদের বৈঠকখানা হতো পশ্চিমমুখী, কদাচিৎ দক্ষিণমুখী।[৬৪] ঘর ও বৈঠকখানার থাকত চওড়া বারান্দা। নগর ও গ্রামের অট্টালিকা ও সুলতানদের প্রাসাদে চওড়া বারান্দা দেখা যায়।

মুসলমানদের বাসগৃহসংলগ্ন মসজিদ থাকত।[৬৫] গ্রামীণ এলাকার মসজিদ তৈরির উপাদান কী ছিল– পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে আমরা তার বিশেষ কিছু জানি না। তবে অনুমান করা অসমীচীন হবে না যে, বাসগৃহ, মাদ্রাসা, মণ্ডপ ও বৈঠকখানা নির্মাণে ব্যবহার্য উপাদান দিয়েই মসজিদ তৈরি হতো। শহর বা উল্লেখযোগ্য স্থানে চুন-সুরকির মসলা দিয়ে মসজিদ তৈরি হতো।[৬৬]

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সমকালীন বাংলার বাড়ি-ঘর সাধারণত উঁচু স্থানে নির্মিত হতো। ভিটা বা ভিটি উঁচু করার জন্য মাটি খননের ফলে পুকুর বা পরিখার সৃষ্টি হতো।[৬৭] পুকুরপাড়েই অনেকে বসবাস করত। পর্যটক আব্দুল লতিফের (১৭শ শতাব্দী) ডায়েরিতে তার উল্লেখ মেলে। তিনি লিখেছেন, 'পরগণা বাঘা গ্রামের মাঝখানে একটি সুন্দর পুকুর আছে। এর স্বচ্ছ পানি বেহেস্তের 'কাওসার'কে হার মানায়। তার চারপাশে দরবেশের সন্তান ও বংশধররা 'চকবন্দি' ঘর নির্মাণ করে বাস করে'।[৬৮] সেসময় ডোমেরা পুকুরপাড়ে বাস করত।[৬৯]

অভিজাত ও উচ্চবিত্তরাও পুকুরপাড়ে বাস করত। বিশেষত মুসলমান পরিবারগুলোর জন্য পুকুর অপরিহার্য ছিল।[৭০] মুসলমান মহিলারা পর্দা করতেন। ফলে স্নানের জন্য তাঁরা বাইরে নদীতে যেতে পারতেন না। পুকুরে স্নান করতেন। তাছাড়া ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কৃষিকার্জের সুবিধার্থে ও বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিখাগুলোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল।[৭১] নিরাপত্তা বিধানের জন্য অনেকে বাসগৃহের চারপাশে পরিখা খনন করতেন। নদীর ধারেও বাসগৃহ নির্মাণের চল ছিল।[৭২] বাড়ির সবাই স্নানসহ সমস্ত কাজ নদীতে সম্পন্ন করত।[৭৩] শুধু তাই-ই নয়, খাওয়ার পর পাশের খালে হাত পর্যন্ত ধুতে যেত।[৭৪]

আজকের মতো তখনও অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে সকলের বাড়ির চারদিকে বেড়ার ব্যবস্থা ছিল। একটি সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি, গৃহস্থের বাটিকা 'বৃত্তিবেষ্টিত' থাকত। বৃত্তি বেষ্টনের মাঝে মাঝে থাকত বৃত্তিবিবর (গবাক্ষজাতীয়

ছিদ্র)। এই বৃত্তিবিবর পথে অন্তঃপুরিকাগণ বাইরের দৃশ্য অবলোকন করতেন।[৭৫]

বিত্তবানদের বাড়ির বেড়া হতো ইটের তৈরি। সাধারণ মানুষেরা দিত নলখাগড়ার বেড়া। সরু নলের বেড়ারও প্রচলন ছিল। ছোট ছোট গাছের ঘন সারি কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেড়ার কাজ করত। প্রতিটি বাড়ির আশে-পাশে খানিকটা করে জমি থাকত। অনেকে সেই জমিতে ফুল-ফলের বাগান করত। ইবনে বতুতা পনেরো দিন নৌপথে ভ্রমণকালে অনেক গ্রাম ও ফলের বাগান দেখেছিলেন।[৭৬] বাড়ির চারপাশের জমি জুড়ে থাকত কলা ও সুপারি গাছ।[৭৭] সেখানে আমরা দেখতে পাই, 'দ্বারে দ্বারে কলা রুইল গুবাক সুন্দর'। সেকালে প্রচুর নারিকেল গাছ ছিল।[৭৮] হুগলী নদীতীরের একটি প্রাচীন গ্রামের ছবিতে নারকেল গাছ দৃষ্ট হয়। এঅঞ্চলে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। বাড়ির চারপাশের জমি জুড়ে বেড়ার মতো তালগাছের সারি থাকত।[৭৯] পোড়ামাটির ফলকে তাল, নারকেল, খেজুর, সুপারি গাছ দেখা যায়। নগরাঞ্চলে তাল ও নারকেল গাছ শোভা পেত।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, সুলতানি বাংলায় বাসগৃহ নির্মাণ ও পরিবেশ রচনায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল। গৃহনির্মাণ উপকরণের সুলভতা ও রুচি বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করত। সুলতান বা শাসক ও অভিজাত তথা বিত্তবানরা তাদের নির্মাণকর্মকে স্থায়িত্বদানের জন্য নদীতীরে সুউচ্চ দৃষ্টিনন্দন ইটকাঠের ইমারত নির্মাণ করেছে। আবার বহু টাকা ব্যয়ে বাঁশ-খড় দিয়েও চৌচালা-আটচালা-বারোচালা ঘর তৈরি করে বাংলার ঐতিহ্যকে লালন করেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসগৃহ নির্মাণে বিশেষ পরিকল্পনা কিংবা পরিবেশের প্রভাব পরিলক্ষিত না হলেও উপকরণগত মিল ছিল। বাঁশ ও খড়ই ছিল তাদের বাসগৃহ নির্মাণের প্রধান উপকরণ। পরিবেশের কোনো বালাই ছিল না। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, জাত-পাতের কারণে গ্রামের প্রান্তরে কিংবা টিলায় বিচ্ছিন্নভাবে বাসগৃহ নির্মাণ করা হতো। নৈসর্গিক কিংবা কোনো রমণীয় পরিবেশে তাদের বাসগৃহ নির্মাণের সুযোগ ছিল না। গৃহনির্মাণে অবস্থানিক ও পরিবেশগত দিক থেকে অভিজাত ও দরিদ্রদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। তবে উপকরণ ও শৈলীগত দিক থেকে তদানীন্তন বাংলার ঐতিহ্যকে সকলেই যুগপৎ লালন করেছে ও সমুন্নত রেখেছে।

টীকা ও তথ্যানির্দেশ

১. গুড়ি ভেলকো, ঢোলা ভেলকো, তরলী, মুলী, মুগর এবং বেউড়ি প্রভৃতি। দেখুন, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, নতুন দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ৭০।

২. অতুল সুর, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা ১৯৭৬, পৃ. ৫৭।

৩. Adris Banerji, *The Temples of Tripura*, Quoted by Zulekha Haque, *Terracotta Decoration of Late Medieval Bengal*, Dhaka 1980, p. 81.

৪. কুমুদরঞ্জন দাস, 'সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশ', *ইতিহাস অনুসন্ধান-৮*, কলিকাতা ১৯৯৩, পৃ. ৩২।

৫. P. C. Baghchi, 'Political Relations between Bengal and China in the Pathan Period,' *Visva Bharati Annals, Vol. 1,* Calcutta 1945, p. 12.

৬. শিলালিপিটি আরবি কবিতায় লেখা। এটি বর্তমানে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে রক্ষিত। শিলালিপিটির শিলা ও লিপি দুই-ই অত্যন্ত সুন্দর। দেখুন, ড. মো. ওসমান গনী, *সুলতানী বাংলার প্রত্যাহিক জীবন*, অপ্রকাশিত পি-এইচ ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী, ২০০০, পৃ. ২১২।

৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্য প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়*, কলিকাতা ১৯৯৬, পৃ. ১৪০-১৪১; 'নয় বৃহন্দ পরে হয়্যা গেলাম, রাজার দরবার'। দেখুন, কৃত্তিবাস, *রামায়ণ*, দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৫৬, পৃ. ২-৩।

৮. Joao de Barros, *Da Asia, Extracts in the Duarte Barbosa, Vol. II, Appendex-1*, pp. 239-248.

৯. উদ্ধৃতি সংগৃহীত, কে. এম. আশরাফ, *হিন্দুস্থানের জন-জীবন ও জীবনচর্যা*, *তপতী সেন* গুপ্ত, অনূদিত, কলিকাতা ১৯৮০, পৃ. ৩৭৩।

১০. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ২৯৩।

'অপূর্ব সুন্দর গৃহ করিল নির্মাণ
ফটিকের স্তম্ভ সব শোভে মনোহর।'

১১. *ঐ*, পৃ. ৩৫৬-৫৭।

১২. *ঐ*, 'হীরা ও ইয়াকুত পুরী নির্মায়, বিশাল'
'হীরা মনি-মনিক্য দেখি এ ঠামে ঠাম'

১৩. *ঐ*, পৃ. ৩০৩। 'সবে খণ্ড গৃহসপ্ত বৈকুণ্ঠ দোসর,
ভ্রমিবারে ক্ষুদ্রবাট আছয়ে বিস্তর।'

১৪. P. C. Bagchi, *op. cit.*, pp. 121, 124; K K Mohammad, 'Hammams (Baths) in Medieval India, *Islamic Culture, Vol. LX11, No 4,* Hyderabad 1988 , pp. 37-56.

১৫. বংশীদাস রায়, *পদ্মপুরাণ*, শ্রীরামনাথ চক্রবতী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩১৮, পৃ. ৯৭।

১৬. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, *আর্য সপ্তশতীতে গৌড় বঙ্গ*, কলিকাতা ১৩৭৮, পৃ. ২৬৩।

১৭. সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতিকা*, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ১০১,
'সুকুড় এসেরে কপাসু ফুটিলা,
ফিটেলি অন্ধারিরে আকাশ ফুটিলা।'

১৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, এসি সরকার সম্পাদিত, চুচুঁড়া ১৩৮৫, পৃ. ২০৪।
'অন্তপুরে সরোবর করিলা নির্মাণ'
পাষাণে রচিলা তার ঘাট চারখান।'

১৯. মালাধর বসু, *শ্রীকৃষ্ণ বিজয়*, ময়মনসিংহ ১৯৪৫ পৃ. ১৭১, দীর্ঘ সরোবরে শোভে তারি চারিপাশ।'

২০. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ,২১৮। 'রচিলেন্ত এক টুঙ্গী অন্তঃপুর'; মযহারুল ইসলাম, *কবি হেয়াত মামুদ*, রাজশাহী ১৯৬১, পৃ. ১৬৩। 'লক্ষে লক্ষে দেখে টুঙ্গী, সুশোভিত নানারঙ্গি,
নির্মাইছে বিবিধ প্রকার'

২১. শাহ মোহাম্মদ সগীর, ইউসুফ *জোলেখা*, এনামুল হক সম্পদিত, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য, ১০৬।

২২. ওয়াজেদ আহসান, 'আজব আজব ঘরবাড়ি', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ২০ ভাদ্র ১৪০০, পৃ. ৬।

২৩. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড,* কলিকাতা ১৯৯৩, পৃ ৫৫৮।

২৪. Abul Fazl, *Ain-I-Akbar, Vol. 11*, Jarret & Sarkar, Calcutta 1948, p. 134.

২৫. মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়েবী*, ২য় খণ্ড, খালেক দাদ চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ১২৮।

২৬. দীনেশ চন্দ্র সেন, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৫৬০-৫৬১।

২৭. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, 'বাংলাদেশের লোক স্থাপত্য,' *বাএসোপ*, ৩য় খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৬।

২৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ৬ষ খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭৪, পৃ. ৭৬

'মাছুয়া পক্ষীর পাখা দিয়া সাজুয়া বানায়'।

২৯. P. C. Bagchi, *op. cit.,* pp, 93-134.

৩০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭০, পৃ. ৩৫৬।

'চৌচালা ডেহেরি খান (ঘর) উডান ঘেষিয়া
ভিতরে আটচালা ঘর উলুখড়ের ছানি।'

৩১. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ২৪৪।

৩২. শাহনারা হোসেন, 'সদুক্তিকর্ণামৃতে বাংলার গ্রাম, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা*, বৈশাখ ১৩৮০, পৃ. ৩৮।

৩৩. সৈয়দ আলী আহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১। 'নগর বাহিরিয়ে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া,

চারি বাঁসে ভইলা রে দিআ চঞ্চালী।'

৩৪. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বাংলার পুরনারী*, কলিকাতা ১৩৩৯, পৃ. ৯৪।

৩৫. Abdul Latif's Accounts, A Description of North Bengal in 1609, tr. by JN Sarkar, *BPP, Vol. xxxv, Pt. 11 SL No. 69-70*, Calcuta 1928.

৩৬. Robert Orme, *Historical Fragments of the Mughal Emperor (ed),* Delhi, 1978, p. 262.

৩৭. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণ চণ্ডী*, নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯২১, পৃ.

'ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে তালপাতা ছাউনী,
ভেরেন্ডার খুঁটি তার আছে মধ্যখানি।'

৩৮. ওয়াজেদ আহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৩৯. প্রেমময় দাস গুপ্ত, *ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত*, কলিকাতা তা.বি., পৃ. ৮০।

৪০. ঐ

৪১. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৪-৫৬৫।

৪২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.)* কলিকাতা ১৯৯৬, পৃ. ৪৬।

৪৩. রাজ শেখর বসু, *চলন্তিকা অভিধান*, কলিকাতা ১৩৮১, পৃ. ২৬৭।

৪৪. জুৎ >জুত > জুইত অর্থাৎ মনমত সুখ, সম্পূর্ণ বা সর্বাঙ্গীন স্বস্তি, যথাযথ, নিখুঁত-নিটোল আরামপ্রদ ঘর প্রসঙ্গে। দ্র. *ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ৪৭৬।

৪৫. মো. আ. বাকী ও নাসরীন আহমদ, 'বাংলাদেশের প্রাচীন বসতির ধরন; একটি রূপরেখা', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪১*, অক্টোবর ১৯৯১ পৃ.৮৪।

৪৬. কে এম আশরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮-২৫৯

৪৭. *ভারত চন্দ্র রায়, ভারত চন্দ্র গ্রন্থাবলী*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনী কান্ত দাস সম্পাদিত কলিকাতা ১৩৬৯, পৃ. ১৬৩।

৪৮. কে এম আশরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।

৪৯. সুধীর কুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ*, কলিকাতা ১৯৬২, পৃ. ১৯০।

৫০. MR Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, Dacca, 1965, pp. 330-31.

৫১. *Ibid.*

৫২. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

৫৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *৬৯ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

৫৪. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, *আর্য সপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, কলিকাতা ১৩৭৮, পৃ. ৭১।

৫৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড*, কলিকাতা ১৯৭২, পৃ. ২৬৯।

৫৬. ক্ষিতীশ চন্দ মৌলিক, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭১, পৃ. ৩৫৬।
'চৌচালা ডোহরিখান (গৃহ) উডান ভরিয়া।'

৫৭. Ludivico de. Verthema, *The Travels of Varthema*, trans., John, Winter Jones, London, 1863, p. 155.

৫৮. সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা*, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৯৩।

৫৯. Quoted by M R Tarafder, *op. cit.*, p. 330.

৬০. উদ্ধৃতি সংগৃহীত, সুকুমার সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩।

৬১. উদ্ধৃতি সংগৃহীত, প্রভাস চন্দ্র সেন, 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন।' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ২৭ *খণ্ড*, ৩ *সংখ্যা*, কলিকাতা ১৩২৭, পৃ. ১৯২.

৬২. *ঐ* ।

৬৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩।

৬৪. দুর্গাচন্দ্র স্যান্যাল (সম্পাদিত), *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩১৩, পৃ. ২২০।

৬৫. শাহ মোহম্মদ সগীর, ইউসুফ *জোলেখা*, এনামুল হক সম্পাদিত, 'প্রতি ঘর দ্বারে দ্বারে মসজিদ নির্মাণ।' ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১২০।

৬৬. কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস, 'সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশ', ইঅ-*৮*, কলিকাতা ১৯৯৩, পৃ. ৩২।

৬৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭০, পৃ. ৩৮০।
'কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুস্কুর্নি কাটায়'।

৬৮. Abdul Latif's Accounts, *op, cit.*, pp 143-144.

৬৯. উদ্ধৃতি সংগৃহীত, জাহ্ণবী কুমার চক্রবর্তী, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে জন-জীবন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

৭০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬।
'বড় পুকুর সামনে যার দশহাত পানি।'

৭১. শরীফ উদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত, *দিনাজপুর: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৬।

৭২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫। 'ভাল কইরা বান্ধে বাড়ি সুত্যা নদীর কানে।' *ঐ* ২য় খণ্ড, পৃ.৩৪০। 'গাঙের কুল্যা বাড়ি।'; ঐ, ৬৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯। 'বাড়ির কাছে গাঙের ঘাট সকাল সন্ধ্যা বেলা'।

৭৩. *ঐ*, ৪র্থ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪, ২৬৫। 'তেল মাইখ্যা বাসু নাই ছান করবার গেল।'
'দেবর-ভাসুর তামাক খ্যায়া করবার গেল ছান।'

৭৪. *ঐ*, ৪র্থ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯। 'চারজনে উইঠা গেল মুখ ধুইবার খালে।'

৭৫. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।

৭৬. Ibn Batutah's Account of Bengal, *op. cit.*, pp.12-13.

৭৭. মালাধর বসু, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, ময়মনসিংহ, ১৯৪৫, পৃ. ৭৮।

৭৮. মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, পৃ. ৭০।

৭৯. সুশীলা মণ্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, প্রথম পর্ব*, কলিকাতা ১৯৬০, পৃ. ২৮।